প্রামাণ্যচিত্রকথা

boobook

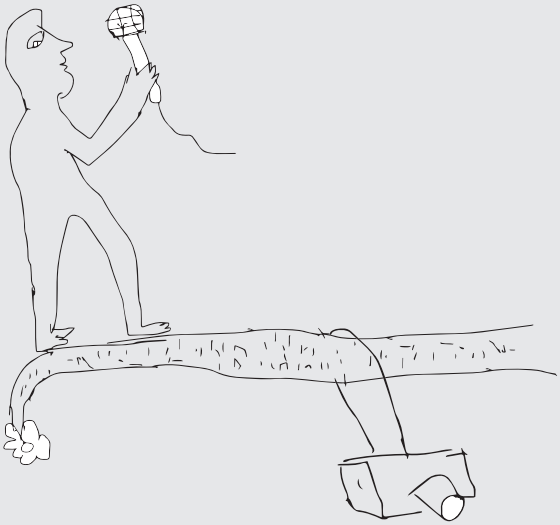

boobook

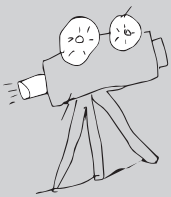

boobook

প্রামাণ্যচিত্রকথা

মাহমুদুল হোসেন

নোকতা

প্রকাশক

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

dak@noktaarts.com, noktaarts.com

+৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

প্রথম নোকতা সংস্করণ আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব

টেক্সট © মাহমুদুল হোসেন

বই © নোকতা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

রাজীব দত্ত

পরিবেশক

বাতিঘর/পাঠক সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক

মনফকিরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

ডিজিটাল প্রিন্ট (ভারত)

ISBN 978-984-93730-1-8

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া
এই বইয়ের কোন অংশেরই
কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না ।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে
উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

pramanno-chitrokotha, a collection of articles on documentary film
by mahmudul hossain published by nokta, october 2018, dhaka, bangladesh

পাঠকের মূল্য: ৳ ৩৩০ । ₹ ৩৩০

বিষয়সূচি

প্রাককথন

০৯

ভূমিকা

১৩

১৭ প্রামাণ্যচিত্র: সত্যবিষয়ক সমস্যা ও কিছু বিবেচনা

২৯ ইতিহাসের প্রামাণ্যকরণ: চলচ্চিত্রকারদের ভূমিকা

৪৩ নিউ মিডিয়া আর্ট ও প্রামাণ্যচিত্র

boobook

প্রামাণ্যচিত্রে বাংলাদেশ

৬১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: প্রামাণ্যচিত্রের অর্জন ও সম্ভাবনা

৮১ বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্র: শিল্প, বিকল্প ও জাতীয়তার সন্ধানে

নির্মাণ ও নির্মাতা

১০১ রোকেয়া: সিনেমাটিক সত্যের শুদ্ধ শীলন

১১৫ এখনো একাত্তর: যুক্তি ও জাগরণের দৃশ্যকাব্য

১২৭ তানভীর মোকাম্মেলের প্রামাণ্যছবি: স্বদেশের সত্য-কোষ

১৫১ চলচ্চিত্রে আন্তঃবিষয়ীগততা পাঠ: ছবি দেশান্তর

১৬৯ তাঁদের যুদ্ধ-কথা: নট এ পেনি নট এ গান

১৭৯ যে গল্পের শেষ নেই: শ্রবণে, দর্শনে পাঠ

১৮৯ ঝলমলিয়া: স্বাদু শেকড়ের সন্ধানে

১৯৭ জন্মসাথীর যাত্রায়

boobook boobook

প্রাককথন

boobook

প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে খুব বেশি ভেবেছি একটা সময় পর্যন্ত, এরকম বলা যাবে না। এখন পেছন ফিরে দেখছি সিনেমা নিয়ে লেখালিখির প্রথম বিশ বছরে প্রামাণ্যছবি নিয়ে বড় জোর তিনটি লেখা লিখেছিলাম। লিখি কম, নিদারুণভাবে কম, কিন্তু তারপরও এত কম নয়! আসলে, তাগাদা ছিল না, কেউ খোঁচায় নি লেখার জন্যে, প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে। না খোঁচালে লিখি না আমি, এ কথা স্বীকার করেছি আগেও।

কিন্তু বছর পনের আগে প্রামাণ্যছবি নিয়ে বিশেষ ঘটনাটি ঘটল। "বাংলাদেশ প্রামাণ্যচিত্র পর্ষদ" প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সংগঠনটি ২০০৩ সালে আত্মপ্রকাশের পর প্রামাণ্যচিত্র বিষয়ে আমার তৎপরতা খুবই বেড়ে গেল। এর সংগঠকরা প্রামাণ্যচিত্রবিষয়ক যেসব অনুষ্ঠান আয়োজন করতে লাগলেন তার বেশ কটিতেই আমি কেমন করে হয়ে গেলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক। মনে হয়, প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ পাঠ যদি খুব লোভনীয় কোনো কাজ হতো তাহলে পর্ষদের সংগঠকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ আনা যেত! এরকম ঢিলে রসিকতা সরিয়ে রেখে যেটা বলা যায়, এই প্রবন্ধ পাঠের আহ্বানগুলো আমার জন্যে ভীষণ উপকারি হয়েছিল। আমি প্রামাণ্যচিত্র বিষয়ে নানাদিক থেকে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। অনেক ছবি প্রথমবারের মতো দেখলাম, আগে দেখা ছবি বারবার দেখলাম। প্রামাণ্যচিত্রের ইতিহাসটা ভালো করে বোঝার

চেষ্টা করলাম। করতে যেতে সিনেমার ভাষা, নিরীক্ষা, প্রযুক্তি এসব বিষয়েও নতুন জানা, নতুন পাঠ হলো।

এর কিছু আগেই বাংলাদেশে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এক ব্যস্ত সময়ে প্রবেশ করেছিল। নতুন হালকা প্রযুক্তি সিনেমা নির্মাণের আনুষ্ঠানিকতায় যে খোলা হাওয়া বইয়ে দিচ্ছিল নব্বই দশক থেকেই, তার সুবিধাটা প্রামাণ্যচিত্রই নিল সকলের আগে। আর যারা চলচ্চিত্রে বিকল্প চিন্তার প্রত্যাশী, উদ্যোক্তা–তারা প্রামাণ্যচিত্রে তাদের আগ্রহটাকে নবায়ন করলেন মাত্র। ফলে, অনেক নতুন নির্মাতা, নতুন ছবি প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে আসতে শুরু করল। লিখেছি, এসব গত শতকের নব্বই দশকের কথা। পরের দশকের শুরুতেই যে প্রামাণ্যচিত্র পর্ষদের প্রতিষ্ঠা–একে প্রামাণ্যচিত্রের এই উত্থানেরই অনিবার্য ধারাবাহিকতা বলে আমি মানি।

নতুন প্রামাণ্যচিত্র দেখা হচ্ছিল কম আর বেশি। "বাংলাদেশ প্রামাণ্যচিত্র পর্ষদ"-এর জন্যে লেখাগুলো তৈরি করতে যেয়ে সে দেখা নতুন পাঠে পরিণত হলো। অবধারিতভাবেই, পর্ষদের জন্যে লেখালিখি করতে করতে প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে আরো লেখার, আরো বক্তৃতা দেওয়ার চাহিদা তৈরি হলো। এভাবে আরো নতুন লেখা হলো, কিছু পুনরাবৃত্তি হলো তো বটেই!

প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে যা লিখেছি গত পনের বছরে তার ভেতর থেকে বেছে নেওয়া লেখাগুলো নিয়ে এই সংকলন-গ্রন্থ। লেখাগুলোর কোনোটি সেমিনার বা ওয়ার্কশপের সুভেনিয়রে এবং পরে কোনো সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। কোনোটি সরাসরি সাময়িকীতে অথবা আমার ব্লগে প্রকাশিত হয়েছে। এসব লেখা একত্রিত করে সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশের একটি আগ্রহ নিজেই বোধ করেছি, কেউ বাইরে থেকে উৎসাহিত করেন নি। তবে, কাজটি হচ্ছে জেনে সকলে ইতিবাচক কথাবার্তাই বলছেন।

তিনটি ভাগে মোট চৌদ্দটি লেখা এই বইতে উপস্থাপিত হলো। এই বিভক্তি কাছাকাছি চিন্তার এবং স্বাদের লেখাগুলোকে পাশাপাশি রেখেছে–এই যা। প্রথম ভাগে কিছু তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার বিস্তার রয়েছে। সেসব ভাবনা খুব মৌলিক কিছু নয়, কিন্তু সম্ভবত প্রামাণ্যচিত্র চর্চায় আগ্রহী জনদের কাছে এরা প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশ ও প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে দুটি লেখা আছে। অবধারিতভাবেই এসেছে মুক্তিযুদ্ধ আর বিকল্প চলচ্চিত্রের কথা। এদেশে এখন পর্যন্ত সিরিয়াস চলচ্চিত্র চর্চায় এ দুটি বিষয়কে এড়িয়ে যাবার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। একেবারে নিছক সময়ের বিবেচনায়ও মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমরা এতখানি দূরে পৌঁছে যাই নি যে, তা আমাদেরকে নিত্যই উত্তেজিত করবে না; আর

সকল বাস্তবতার নিরিখে আমাদের আবেগ ও বুদ্ধি মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রেক্ষাপটের দ্বারা ক্রমাগতই প্রণোদিত হচ্ছে, চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ছে। প্রামাণ্যচিত্রনির্মাতারা বারবার ফিরে যাচ্ছেন সেই সময়ে, অথবা সেই সময়ের ধারাবাহিকতায়। আমার লেখাটি তাদেরকে অনুসরণ করেছে মাত্র। আর বিকল্প চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশের এক প্রবল সম্ভাবনা-ক্ষেত্র আমাদের দেশে–এই প্রকল্পে আমি আস্থাবান। এই সুযোগে প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পকে বিস্তৃত করেছি। সত্যি বলতে কী, এই ভূমিকা যখন লিখছি তখন এরকম মত আমাকে ঘিরে রয়েছে যে, প্রামাণ্যচিত্র মাত্রই বিকল্প এক চলচ্চিত্রিক কর্মযজ্ঞ সকল বাস্তবতায়; আমাদের দেশে তো বটেই; আর এই প্রামাণ্যচিত্রের মধ্যেই জাতীয় চলচ্চিত্রের এক সংহত রূপ লাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি! তৃতীয় ভাগটি আসলে নির্দিষ্ট চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার অধ্যায়। যেসব ছবি নিয়ে নানাভাবে উত্তেজিত বোধ করেছি তাদের নিয়ে আলোচনা করে নিজের বোঝাপড়াকেই স্পষ্ট করতে চেয়েছি আসলে। এসব লেখাকে প্রচলিত অর্থে চলচ্চিত্র-সমালোচনা বলা যাবে কি না সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। বরং, এসব লেখা সৃজনশীল কাজ নিয়ে কিছু ভাবনার বিস্তার–এ পর্যন্তই। যে বলছিলাম তাগাদা না থাকলে লিখি না, দেখছি সেটি আর সত্যি নয়! এ পর্যায়ের একটি লেখাও কোনো সম্পাদক বা সেমিনার-কর্তার তাগাদায় লেখা নয়। নিজেই এসব ভাবনার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছি ছবি দেখার পর। আরো কিছু ছবি নিয়েও লিখতে চেয়েছি; কিন্তু বারবার দেখার সুযোগ না থাকায় সে কাজটি করা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে।

প্রামাণ্যচিত্রনির্মাতা এবং প্রামাণ্যচিত্র পর্ষদের তারা–মানজারেহাসীন মুরাদ, মঈনুল হুদা, ফৌজিয়া খান, আনোয়ার চৌধুরী, শবনম ফেরদৌসী–প্রামাণ্যচিত্রবিষয়ক লেখালিখির মধ্যে আমাকে স্থাপিত করেছেন প্রায়! প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাধিক লেখার ধারণাটিও এসেছে তাদের কারো মাথা থেকে। এরা সকলে বন্ধুস্থানীয়। কৃতজ্ঞতার বদলে বড় করে ধন্যবাদ জানাই; আর সকলের কাছে নতুন প্রামাণ্যচিত্রের দাবি জানিয়ে রাখি! মুরাদ ভাই একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন; নিঃসন্দেহে এতে এই বইয়ের মর্যাদা বেড়েছে। প্রচ্ছদশিল্পী রাজীব দত্তকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার বরাবরের প্রকাশক নোকতা এই বই বের করছে। আশা করি এই প্রকাশ তাদের সুনামকে অক্ষুন্ন রাখবে।

মাহমুদুল হোসেন

ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮

ভূমিকা

boobook

চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান শাখা হিসেবে শুরু থেকেই চর্চিত ও বিকশিত হয়ে আসছে প্রামাণ্য এবং প্রামাণ্যধর্মী চলচ্চিত্র। কথাটার সাথে প্রথমেই সবাই একমত হবেন না হয়তো। এর কারণও রয়েছে। তবে পেছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে ঊনিশ শতকের শেষ দশকে এসে যে সর্বাধুনিক শিল্প ও সংযোগ মাধ্যমের উদ্ভব হল তার প্রধান পরিচয় এর প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যধর্মীতা, একথা অনস্বীকার্য।

চলচ্চিত্রের আপাত বেগবান এবং সর্বগ্রাসী শাখা হিসেবে কাহিনীচিত্রকে স্বীকার করলেও চলচ্চিত্রের আদি প্রেরণা ও রূপ যে প্রামাণ্যচিত্রেই মেলে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বস্তুত চলচ্চিত্রের মূল পরিচয় প্রামাণ্যচিত্রেই। চোখের সামনে যে বাস্তবতা আমরা দেখি তার পুন:উপস্থাপনার লক্ষ্যেই চলচ্চিত্র আবিষ্কারের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল। অন্য প্রকাশ ও শিল্পমাধ্যম থেকে চলচ্চিত্রের গুণগত পার্থক্য এখানেই। আর প্রামাণ্যচিত্রের মধ্যে এই গুণটি অন্য ধারাগুলির চাইতে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত। প্রামাণ্যচিত্রের এই বাস্তবতা চোখে দেখা বাস্তবতার অবিকল অনুসরণ নয়। এ একধরনের নির্বাচিত বাস্তবতা যা সামগ্রিক বাস্তবতাকে তুলে ধরতে অনেকটাই সক্ষম।

তাই যে কোনো সার্থক প্রামাণ্যচিত্রে বাস্তবতার পর্যাপ্ত হদিস যেমন মেলে, তেমনি সেই বাস্তবতা যে সত্যকে প্রতিফলিত করে তারও সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এ কোন ধ্রুব সত্য নয়। বাস্তবতার ব্যক্তিগত উপলব্ধিজাত অর্জিত সত্য। এই বিষয়টি একরৈখিক নয়। এর সম্ভাবনা বহুমাত্রিক।

মাহমুদুল হোসেনের "প্রামাণ্যচিত্রকথা" গ্রন্থে এসব কথার হদিস পাওয়া যাবে যুক্তির উজ্জ্বলতায়। বিগত প্রায় সোয়া শ বছর ধরে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে যেসব প্রবণতা প্রামাণ্যচিত্রের তাত্ত্বিকরা লক্ষ করেছেন তার তালিকা অনেকটা এ রকম:

-To record
-To persude
-To promote
-To analyze
and
–To express (*Theorizing Documentary, Ed: Michael Renov*)

মাহমুদুল হোসেনের বর্তমান বইটিতে উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলোর সবটাই আলোচিত হয়েছে কখনো তাত্ত্বিকের মননের পরিচর্যায়, কখনো তার স্বদেশের প্রেক্ষাপটের একান্ত অবলোকনে। তাই গুঢ় তাত্ত্বিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি এ দেশের কিছু চলচ্চিত্রের আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা পায় গ্রন্থটির পরিকল্পনায়। আমাদের দেশের প্রামাণ্যচিত্রে তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ যত অসম্পূর্ণই হোক না কেন–তার আলোচনা এই বইটিকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তোলে। আর এরই মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের প্রামাণ্যচিত্রের তো বটেই, সামগ্রিক চলচ্চিত্রেরই এক অসামান্য সমালোচনার নিদের্শ পাই আমরা–যা আমাদের চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে একান্তই দুর্লভ।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে সবচাইতে ভাবনা উদ্রেককারী প্রবন্ধটি হচ্ছে, "ইতিহাসের প্রামাণ্যকরণ: চলচ্চিত্রকারের ভূমিকা"। তার অর্থ এই নয় যে, অন্য প্রবন্ধগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে ইতিহাস চর্চার প্রসঙ্গে প্রামাণ্যচিত্রের ভূমিকার গুরুত্ব সনাক্ত করার ভেতর দিয়ে তিনি যে এই উপলব্ধিতে পৌছেছেন যে, এই ভূমিকা পালনের ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক আঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে প্রামাণ্যচিত্র–সেটি এক উল্লেখযোগ্য

প্রাপ্তি বটে। আমাদের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ইতিহাস চর্চায় প্রামাণ্যচিত্রই যে সবচাইতে কার্যকর চলচ্চিত্র ধারা সেটি লেখক যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেটি লেখকের চলচ্চিত্র ভাবনার অগ্রসরতারই প্রমাণ রাখে। সেই সাথে তিনি ইতিহাস সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যায় প্রামাণ্যচিত্রের গুরুত্ব ও শক্তির কথা উল্লেখ করতেও ভোলেন নি। একই সাথে লেখক এই সত্যের লোভও দেখান চলচ্চিত্রকারদের যে, তারা উদ্যোগী হলে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক চলচ্চিত্রিক ভাষ্য রচিত হতে পারে তাদের হাতে এবং সফল চলচ্চিত্রকারের সম্মানের পাশাপাশি একজন প্রামাণ্যকার হয়ে উঠতে পারেন ইতিহাসের নতুন এক ভাষ্যকার, এক ঐতিহাসিক।

আমাদের সকলেরই জানা আছে চলচ্চিত্র একটি কারিগরি-নির্ভর মাধ্যম। এই কারণে চলচ্চিত্রের ব্যবহার, চলচ্চিত্রের চেহারা এবং প্রকাশ-ভঙ্গি নতুন নতুন কারিগরি উদ্ভাবন দ্বারা এতো ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে যা অন্য কোন শিল্পমাধ্যমে ঘটে নি। আর সে কারণেই নতুন নতুন কারিগরি উদ্ভাবন নতুন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে চলচ্চিত্র মাধ্যমের। ডিজিটাল প্রযুক্তি, নতুন মিডিয়ার প্রয়োগে যে এক নতুন প্রামাণচিত্রের জন্ম হয়েছে–এরও বিস্তারিত আলোচনা দক্ষতার সাথে গুরুত্ব দিয়ে করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। এটি তাঁর অগ্রসর শিল্প-ভাবনার পরিচয়বাহী। আরো যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এই বইতে আলোচিত হয়েছে তার সন্ধান পাঠক পাবেন সূচিপত্রে চোখ রাখলেই। এবং এই বিষয়-বৈচিত্র্য গ্রন্থটিকে আরো প্রয়োজনীয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মান, এর অর্জনের যে সামান্যতা; বিশেষ করে প্রামাণ্যচিত্রের প্রতি একধরনের অবহেলা ও চর্চার নিরুৎসাহের প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক আলোচনার গ্রন্থ প্রকাশ সত্যি বিস্ময়কর। মাহমুদুল হোসেন যে সেটি করেছেন তাতে কেবল পথপ্রদর্শক-এর কাজটিই হয় নি, তিনি আমাদের চলচ্চিত্র-জগতে অগ্রসর চলচ্চিত্র-ভাবনার মানুষ হিসেবে নিজের অস্তিত্ব জানান আবারো জোরালোভাবে দিয়েছেন।

একজন চলচ্চিত্র কর্মী, বিশেষ করে প্রামাণ্যচিত্র ধারার কর্মী হিসেবে এ বই হাতে পেয়ে আমি আহ্লাদিত।

মানজারে হাসীন
ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৮

boiboi.com

প্রামাণ্যচিত্র: সত্যবিষয়ক সমস্যা ও কিছু বিবেচনা

চলচ্চিত্র যেন সত্য বা বাস্তবতার (আপাতত কিছুক্ষণ সত্য এবং বাস্তবতা কথা দুটিকে সমার্থক ধরে নিয়ে চলা যাক) আধার। এই যে চলমান ইমেজ—এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ভোক্তার মধ্যে এ এক ব্যাপক সত্যবাদী গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণ করে। লিখিত টেক্সট, সঙ্গীত বা নাটকের সে ক্ষমতাই নেই। রেডিওর নাটকে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় স্টুডিওর একটি অমনি-ডাইরেকশনাল মাইক্রোফোনের চারধারে দাঁড়িয়ে, মঞ্চ-নাটকের সেটকে দর্শক কোনোদিন বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে মাপতে আগ্রহী হয় না, আর গল্প বা উপন্যাস তো আমরা পড়ি কাগজে, দেখি না কিছুই। তর্কের খাতিরে বলা যায় রেডিওর নাটক অকুস্থলে যেয়ে অভিনয় করা যেতে পারে বা উপন্যাস হতে পারে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা। কিন্তু ভোক্তা ঘটনার স্থানে এবং সময়ে উপস্থিত হওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না। চলচ্চিত্রের সত্যের অভিজ্ঞতা নির্মাণের যে ক্ষমতা এর কাছাকাছি আবহ নির্মাণ করতে পারতেন গেল শতকের কিছু তুখোড় রেডিও কমেন্টেটররা—যারা খেলা বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অসাধারণ জীবন্ত ধারাবর্ণনা দিতে সক্ষম ছিলেন। রেডিওর শ্রোতারা বিমুগ্ধ, বিস্ময়ে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের প্রায়-সাক্ষী হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা লাভ করত। কিন্তু চলচ্চিত্র—এমনকি কাহিনীচিত্র, দর্শককে

সত্যবিষয়ক এক অনন্য বিভ্রমে জড়িয়ে ফেলে। আমার পরিচিত একজন চিত্রনায়িকা শাবানাকে একটি চলচ্চিত্রে শাড়ী চুরির অভিযোগে শাস্তি পেতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন—শাবানার মতো নায়িকার শাড়ীর অভাব! লক্ষ করি শাবানা যে নায়িকা, অর্থাৎ চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী এটা তিনি ভুলে যান নি, কিন্তু, শাবানাকে শাড়ী চুরির অপবাদ দেওয়া হচেছ যে একটা সিনেমায়—যেটা সত্য নয়, বানানো গল্প—এটা তার মধ্যে কাজ করছে না। চলচ্চিত্রে, কাহিনীচিত্রেই, ঘর পুড়িয়ে দেওয়া, প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বন বা দামি রেস্তোঁরায় খাওয়া—এগুলি কিন্তু একটা পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবে ঘটাতে হয়। বলছি না, এগুলি সত্য হতে হয়—অর্থাৎ, আসলেই একটা আস্ত বাড়ি পুড়িয়ে দিতে হয় (নির্মাতা তারকোভস্কি আর চলচ্চিত্রটি স্যাক্রিফাইস না হলে!), নায়ক-নায়িকা আন্তরিকভাবে পরস্পরকে চুম্বন করে থাকেন বা দামি রেস্তোঁরায় ভরপেট খেয়ে থাকেন। বাস্তবতা এবং সত্যের একটা পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেল কি! হয়তো এই লেখা এগুতে থাকলে আমরা বাস্তবতা এবং সত্যের আরো কিছু ভিন্ন, ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যাব। দর্শক এই বাস্তবতাকে নিজের মতো করে একটি আপেক্ষিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, রাত সাড়ে আটটা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কলকাতা আর মুম্বাই থেকে প্রচারিত (এখন ঢাকাতেও হচ্ছে কি?) প্রতিদিনের টিভি সিরিয়ালগুলো যারা প্রায় নিয়ম করে ওষুধ খাবার মতো দেখে থাকেন তাদের একটা বাড়তি বাস্তবতার সৃষ্টি হয়। এই বাস্তবতা তাদের পেশা, সংসার, সমাজ এসবের সমান্তরাল এক নিঃসঙ্গ, নিজস্ব, ভয়ারিস্ট বাস্তবতা।

আসলে ইমেজ হচ্ছে বাস্তবতার ফাংশানাল এক্সপ্রেশন বা অভিব্যক্তি। যখনই একটি ইমেজ নির্মিত হচ্ছে তখন তা সরাসরি একটি দেশ-কালের প্রতিনিধিত্ব করছে। ইমেজটির বাস্তবতা স্টুডিওতে সেট ফেলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে না কি প্রতিদিনের যাপিত জীবন থেকে ছেঁকে নেওয়া হয়েছে সেটি কিন্তু ভিন্ন ব্যাপার এবং দর্শক চেতনে এবং অবচেতনে এই বাস্তবতা বা তার প্রতিবিম্বের ভেতর কীভাবে কোনো সত্যের সন্ধান করবে তা চলচ্চিত্র নির্মাতার জন্য একটি চ্যালেঞ্জই বটে। যেকোনো চলচ্চিত্রের মধ্যেই দর্শক সত্যের সন্ধান করতে পারেন, সম্ভবত বাস্তবতা সত্যের একটি মোড়কের মতো ব্যাপার যা মানুষকে উসকে দেয় ভেতরের উপাত্তকে খুলে দেখতে। তাহলে এটা চলচ্চিত্রের নিয়তি যে সে, সব রকম চলচ্চিত্র, সত্যের আধার।

"Sometimes you have to lie to tell the truth" (ফ্লাহার্টি: ২০০৩) কিন্তু আমরা কথা বলতে চাই প্রামাণ্যচিত্র এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সত্য বা

বাস্তবতা প্রসঙ্গে। প্রথমেই যা মনে হয় তা হলো, এ প্রসঙ্গে আর অধিক কী বলার থাকতে পারে! প্রামাণ্যচিত্র তো প্রমাণ নিয়েই হাজির—ডকুমেন্টারি ফিল্ম যার মূল কাজ ডকুমেন্টেশন। বরং নন-ফিকশন পদটি গোলমেলে এভাবে যে, এক ধরনের ছবি কী নয় তা বলে তার সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। উদ্যোগটা ঋণাত্মক এবং আমার মোটের ওপর পছন্দের নয়। আসলে নন-ফিকশন বলে কী করতে চাওয়া হচ্ছে? কেবল প্রমাণ করা নয়, আরো কিছু করে যেসব ছবি, কিন্তু বানিয়ে বলে না কিছুই—তাদের একটা দলে আনার চেষ্টা, তাই তো? এভাবে বলার মধ্যে, অবচেতনে একটা দুর্বলতা বা ভীতি কাজে করে কি—গল্প বলে ফেলার ভীতি? অথচ গল্প আর সত্য তো বিপ্রতীপ প্রস্তাবনা নয়। গল্পের ভেতর দিয়ে সত্যে পৌঁছুনো যেতে পারে, যেমন সত্য পরিণত হয় গল্পে, কিংবদন্তিতে। তবে একরৈখিক শুরু-শেষ প্যারাডাইমের ন্যারেটিভ প্রতিবন্ধক হতে পারে—বাস্তবতা থেকে সত্যের উত্তরণের ক্ষেত্রে। সেরকম গল্প সত্যি কাম্য নয় আমাদের প্রামাণ্যচিত্রে। অথবা কেন একথা ভুলে যাব যে, সত্যই একমাত্র আরাধ্য নয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার এবং তিনি যা যেমন করে বলতে চান তার একটি বাহন গল্প না হতেই পারে। প্রমাণ করা বা প্রামাণ্যকরণ (ডকুমেন্টেশন)—এর ভেতর এক ধরণের অসৃষ্টিশীলতার গন্ধ পাওয়া যেতে পারে যার তকমা 'নানুক (*নানুক অব দ্য নর্থ*: রবার্ট ফ্লাহার্টি: ১৯২২, আমেরিকা)' থেকে শুরু করে 'কালিঘর (*কালিঘর*: তারেক শাহরিয়ার: ১৯৯৯, বাংলাদেশ)' বা 'স্বাধীনতা (*স্বাধীনতা*: ইয়াসমীন কবির, ২০০৩, বাংলাদেশ)' পর্যন্ত কাউকেই দেওয়াটা মহা অন্যায় হবে। তাহলে কী বলব—সত্যানুসন্ধানী (ট্রুথ সিকারস), বাস্তব-বিনির্মাতা (রিয়ালিটি ডিকন্সট্রাক্টর)? কেউ যেন না ভাবেন আমার লক্ষ্য প্রামাণ্যচিত্রের একটি বিকল্প নাম প্রস্তাব করে খ্যাতি লাভ করা। আমি আসলে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার 'টার্মস অব রেফারেন্স'টা বুঝতে চাইছি এবং এর আওতায় সত্য এবং/অথবা বাস্তবতার জায়গা-জমিনটার হদিস পেতে চাচ্ছি। ফ্লাহার্টি দেখা যাচ্ছে সত্য আবিষ্কার করবেন বলে মিথ্যা বলতে রাজি ছিলেন। সত্য আবিষ্কার অথবা শেষ কথা হিসেবে সত্য বলার গুরুত্বটা তাহলে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে যে, উত্তরের সেই নানুক, তার জনপদ আর জীবনকে জানার জন্যে দর্শক আর তাদের মাঝে ফ্লাহার্টি স্বয়ং না থাকলেই বোধ করি সবচেয়ে ভালো হতো!! ফ্লাহার্টি আর তার ক্যামেরাকে প্রকৃত সত্য (এরকম কিছু আছে কি?) জানার ক্ষেত্রে একটা বাধা বলেই মনে হয়। এরকম নৈরাজ্যকর একটি কথা পেশ করে ফেলার পর কিছু কৈফিয়ত দিতে তাহলে আমি বাধ্য। আসলে

একটি এড়িয়ে না যেতে পারার মতো অমোঘ মাত্রা—এটি অনিরামেয় এবং এখনও পর্যন্ত আমাদের, দর্শকের, জন্যে সুসংবাদ।

সূত্র-নির্দেশঃ

ফ্লাহার্টি, রবার্ট (২০০৩)। *রিল লাইফ স্টোরিজ*: ডকুমেন্টারি ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও কালেকশনস, ইউ সি বার্কলে লাইব্রেরির মিডিয়া রিসোর্স সেন্টার। http://www.lib.berkeley.edu/MRC/reellife/ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ গৃহীত।

গডমিলো, জিল (১৯৯৭)। *হাউ রিয়েল ইজ দ্য রিয়েলিটি ইন ডকুমেন্টারি ফিল্ম*, জিল গডমিলো ইন কনভারসেশন উইথ অ্যান-লুইস শাপিরো। http://www3.nd.edu/~jgodmilo/reality.html সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ গৃহীত।

ও'রুরক, ডেনিস (?)। *ডকুমেন্টারি ফিকশনস: বিবলিওগ্রাফি, ট্রুথ অ্যান্ড মরাল লাইজ*। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব অস্ট্রেলিয়া। http://www3.nd.edu/~jgodmilo/reality.html থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ গৃহীত।

সাভাজ, জুলিয়ান (২০০২)। *নেগোশিয়েটিং ট্রুথ ইন দ্য রিয়েল ডকুমেন্টারি ফিল্ম (অর ইজ ইট ভিডিও?)*। সেন্সেস অব সিনেমা, মে ২০০২। http://sensesofcinema.com/2002/festival-reports/real/ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ গৃহীত।

কনমস, জন (২০০০)। এরোল মরিস অ্যান্ড দ্য নিউ ডকুমেন্টারি। সেন্সেস অব সিনেমা, জুন ২০০০। http://sensesofcinema.com/2000/festival-reports/sfferrol/ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ গৃহীত।

[রচনাকাল অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৫। বাংলাদেশ প্রামাণ্যচিত্র পর্ষদ আয়োজিত সেমিনারে শ্রুতি-অবলোকন উপস্থাপনা হিসেবে উপস্থাপিত। সেপ্টেম্বর ২০০৫।]

প্রথম প্রকাশ: উলুখাগড়া, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬, সম্পাদক: সিরাজ সালেকীন, প্রকাশক: মো: সিরাজুল ইসলাম।

boibook